পথ পরিচিত

পথ পরিচিতি

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।



প্রকাশকঃ

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া

শওকত প্রিন্টার্স

১৯০/বি, ফকিরেরপুল, XvKv-1000|
মোবাইলঃ 01711-264887, 01715-302731
প্রচ্ছদঃ আবদুর রোউফ সরকার
বিনিময়ঃ ২.০০ টাকা/অফসেট ৮.০০ টাকা
পঞ্চম সংস্করণ/ডিসেম্বর, ২০০৭ ইং।



সত্য পথের পথিকগণই কেবল নির্ভুল গন্তব্যে পৌঁছতে সক্ষম। এই পথেই লাভ হয় সর্বোচ্চ সম্পদ ‘আল্লাহ্পাকের সন্তুষ্টি’।

এই পথ ইসলামের পথ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এই পথের পরিচিতি বিস্তারিতভাবে তাঁর তেইশ বছরের পয়গম্বরী জীবনে বর্ণনা করে গিয়েছেন।

তিনি অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সর্বকালের মানুষের নবী। নবীদের নবী। জ্বিন ফেরেশতা— সমস্ত মখলুকাতের নবী।

তিনি আল্লাহ্পাকের হাবীব— প্রেমাষ্পদ। তাঁর অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী। তাঁর প্রবর্তিত পথ ব্যতিরেকে আল্লাহ্ প্রাপ্তির আর কোনো পথ নেই। ঐ ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞানী, যিনি তাঁর সফল অনুসরণের সাধনায় আমৃত্যু নিয়োজিত রয়েছেন।

ইসলাম পূর্ণ দ্বীন— পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এই পূর্ণতা এমনই পূর্ণতা যে, তার মধ্যে সংযোজন ও বিয়োজনের কোনোই অবকাশ নেই। এই দ্বীন পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং পরিবর্জনের প্রয়োজন থেকে মুক্ত। হজরত আদম আঃ এর মাধ্যমে যে দ্বীনের বীজ বপন করা হয়েছিল, সেই দ্বীন বিভিন্ন নবীগণের মাধ্যমে কালক্রমে পত্র-পুষ্পে পল্লবিত হয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে মহানবী সঃ এর নিকটে এসে। আল্লাহ্পাক সে কথাই এরশাদ করেছেন এভাবে, 'আজকে আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম'। এই দ্বীন আমাদের জীবনে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করাই আমাদের প্রধান কর্তব্যকর্ম। আল্লাহ্পাকের হুকুমও এই রকম। তাই এরশাদ হয়েছে 'হে

ইমানদারগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে দাখিল হয়ে যাও'।

মহানবী সঃ তার অন্তিম ভাষণে জানিয়ে দিয়েছেন, আমার পরে তোমরা দু'টি জিনিসকে আঁকড়ে ধরবে— তবেই তোমরা ভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। সে দু'টি জিনিস হচ্ছে— কোরআন ও হাদিস।

আল কোরআন ও আল হাদিসের মধ্যেই আমাদেরকে পূর্ণ দ্বীনের স্বরূপ তালাশ করতে হবে। এর বাইরে আমাদের চিন্তা-চেতনাকে পরিচালিত করার কোনোই অবকাশ নেই। আবার কোরআন হাদিসের ঐরূপ অর্থই নিতে হবে, যেরূপ অর্থ উদ্ধার করেছেন আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সম্মানিত ইমামগণ। কারণ শিয়া, মোতাজিলা, খারেজী, কাদিয়ানী, মওদুদী প্রভৃতি পথভ্রষ্ট দলও কোরআন ও হাদিস থেকেই দলিল প্রমাণাদি পেশ করে থাকে। তাদের প্রদত্ত কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যা প্রবৃত্তিপ্রসূত এবং সত্যবিচ্যুত। একমাত্র আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেমগণই কোরআন হাদিসের সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের শিক্ষাধারা

সম্মানিত সাহাবায়ে কেরাম রাঃ এবং সলফে সালেহীনের অনুসরণের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। এই জামাতই আল্লাহ্পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের পথে পথিকৃৎ। এই জামাতই নাজাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের জামাত।

তাই প্রতিটি মুসলমানের জন্য প্রথম ফরজ কাজ, এই জামাতের আকিদা বিশ্বাস অনুযায়ী নিজেদের আকিদা বিশ্বাস বিশুদ্ধ করা।

আকিদা বিশ্বাস বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এরকমঃ

১. আল্লাহপাকই অস্তিত্ব। আর যাবতীয় বস্তুকে আল্লাহ্পাকই অস্তিত্ব প্রদান করেছেন।

২. আল্লাহ্পাকের জাত (অস্তিত্ব) এক, সেফাত (গুণাবলী) এক এবং আফআলও (কার্যাবলী) এক। কোনো ব্যাপারেই তাঁর সঙ্গে কারও কোনো শেরকত (অংশ) নেই।

৩. আল্লাহ্পাকের জাতের মতো তাঁর সেফাত এবং আফআলও বেমেছাল (আনুরূপ্যবিহীন)। যেমন— এলেম (জ্ঞান) সেফাত— এই গুণ আদিঅন্তহীন, অবিভাজ্য এবং

আনুরূপ্যবিহীন। সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় এলেম সেফাত কর্তৃক বিকশিত হয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা সমস্ত বস্তুকে তাদের অনুকূল প্রতিকূল অবস্থায় আংশিক ও সমষ্টিগতভাবে প্রত্যেকের বিশিষ্ট সময় সহ এক অবিভাজ্য মুহূর্তেই জেনেছেন। আল্লাহ্পাকের এলেম খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া এবং অন্য কারো মতো হওয়া থেকে পবিত্র। আল্লাহ্পাকের অন্যান্য সেফাতকেও এইরূপ ধারণা করতে হবে। যেমন— কালাম (বাক্য) সেফাত। এই সেফাতও অবিভাজ্য, অতুলনীয় এবং এক। আল্লাহ্পাক আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ঐ একটি বাক্য দ্বারাই বক্তা। আদেশ, নিষেধ, বিজ্ঞপ্তি অথবা যে কোনো বিষয়ের বর্ণনাই হোকনা কেন, তা ঐ একই বাক্য থেকে উৎসারিত। তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর অথবা কোরআন— সবই ঐ এক কালাম (বাক্য) সেফাত থেকে এসেছে। আল্লাহ্তায়ালার অন্যান্য সেফাতও তাঁর জাতের মতোই এক, অবিভাজ্য এবং তুলনাবিহীন।

এরকম— আল্লাহ্পাকের আফআলও (কার্যকলাপ) এক, অবিভাজ্য এবং আনুরূপ্যবিহীন। সৃষ্টির শুরু

থেকে শেষ পর্যন্ত যাবতীয় কার্যকলাপ (সৃষ্টি-ধ্বংস, জীবন-মৃত্যু, উত্থান-পতন ইত্যাদি) ঐ এক ও অতুলনীয় কার্যেরই বিকাশ।

৪. আল্লাহ্তায়ালা কোনো বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করেন না এবং কোনো বস্তুও তাঁর মধ্যে প্রবেশ করে না। তিনি যাবতীয় বস্তুকে ঘিরে আছেন, যাবতীয় বস্তুর সঙ্গে আছেন; কিন্তু এই ঘিরে থাকা ও সঙ্গে থাকা সম্পর্কে আমাদের ধারণায় যা আসে সেরকম অবশ্যই নয়। তিনি ধারণার অতীত।

৫. আল্লাহ্পাকের জাত, সেফাত ও আফআলের মধ্যে কোনো পবিবর্তন হয় না।

৬. আল্লাহ্তায়ালা গনি অর্থাৎ শর্তবিহীন, অভাবশূণ্য। তাঁর জাত, সেফাত, আফআল— সর্ববিষয়েই তিনি গনি। কোনো বিষয়েই তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। অস্তিত্বে, গুণাবলীতে, কার্যাবলীতে সর্ব বিষয়েই তিনি অমুখাপেক্ষী।

৭. আল্লাহ্পাক যাবতীয় ক্ষতি এবং নতুনত্বের কালিমা থেকে মুক্ত। তিনি দেহবিশিষ্ট নন— স্থান

কালসম্ভূতও নন। সমস্ত প্রকার পূর্ণতা একমাত্র তাঁরই মধ্যে বর্তমান।

৮. আল্লাহ্তায়ালা আদি-অন্ত শূন্য। তিনি ব্যতীত অন্য কেউই আদি-অন্ত শূন্য নয়।

৯. আল্লাহ্তায়ালা সর্বশক্তিমান ও ইচ্ছাময়। তিনি ইচ্ছা এবং শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি বাধ্যতা থেকে পবিত্র। যাবতীয় সৃষ্টি সর্বশক্তিমান ও ইচ্ছাময়ের সৃষ্টির প্রতি নির্ভরশীল। তিনিই সমগ্র সৃষ্টিকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। অতএব, সৃষ্ট বস্তুসমূহের অস্তিত্ব যেমন অস্তিত্বপ্রাপ্তি হিসেবে তাঁর মুখাপেক্ষী, তেমনি স্থায়িত্ব লাভের জন্যও তাঁরই মুখাপেক্ষী।

১০. সৃষ্ট বস্তুসমূহ যেমন আল্লাহ্পাকের সৃষ্টি, তেমনি তাদের মধ্যে দৃশ্যমান তাছিরও (প্রতিক্রিয়াসমূহ) তাঁরই সৃষ্টি। যেমন আগুনের প্রজ্জ্বলন শক্তি, ঔষধের রোগ নিরাময় ক্ষমতা ইত্যাদি। সাধারণভাবে বস্তুসমূহের তাছির স্বীকার করতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এইরূপ

ধারণা রাখতে হবে যে, আল্লাহ্তায়ালার ইচ্ছা না হলে কোনো বস্তুর তাছিরতো দূরের কথা, সেই বস্তুর অস্তিত্বও অবলুপ্ত হতে বাধ্য।

১১. সৃষ্ট বস্তুর তাছির থেকে উপকার গ্রহণ তাওয়াক্কোল (আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরতা) বিরোধী নয়; বরং এরকম করাই প্রকৃত জ্ঞানীর স্বভাব। যেমন রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধ সেবন, যুদ্ধবিজয়ের জন্য অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা, পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

১২. আল্লাহ্তায়ালা ভাল মন্দ উভয় কার্যের স্রষ্টা। কিন্তু ভাল কাজে তিনি সন্তুষ্ট এবং মন্দ কাজে অসন্তুষ্ট। বান্দাগণের কেবল মাত্র ইচ্ছা করবার অধিকার আছে। বান্দাগণ ভাল অথবা মন্দ কাজের ইচ্ছা করলে আল্লাহ্পাকই তা সৃষ্টি করে দেন। তাই সৃষ্টিকরণের কাজ আল্লাহ্তায়ালার সঙ্গে এবং এরাদা (ইচ্ছা) করবার স্বাধীনতার কারণে অর্জন করা বান্দাগণের সঙ্গে সম্বন্ধিত।

১৩. তকদীরের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। তকদীর অর্থ ভাগ্যলিপি। আল্লাহ্পাক যেহেতু আদি-অন্তের জ্ঞানসম্পন্ন তাই তিনি প্রত্যেকের কর্মফল সম্পর্কে অবশ্যই জানেন। তাঁর জ্ঞাতব্য বিষয় পূর্বাহ্নে লিপিবদ্ধ করা আছে। তার নামই তকদীর।

১৪. বেহেশত ও দোজখ বর্তমান আছে। বেহেশত লাভকারী ব্যক্তিগণকে অবশ্যই ইমানদার হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে বেহেশতে প্রবেশ আল্লাহ্পাকের মেহেরবাণীর উপর নির্ভর করে। আর ইমান হচ্ছে আল্লাহ্পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ মেহেরবাণী।

১৫. দোজখে প্রবেশের কারণ কুফরি (অবিশ্বাস)। ইমানদার মানুষ কোনো গুনাহ্র কাজে লিপ্ত হলে পার্থিব বিপদ-আপদের মাধ্যমে তার ক্ষতিপূরণ হয় অথবা আল্লাহ্পাক মৃত্যুর সময় কষ্ট দিয়ে তাকে পাপমুক্ত করে নেন। এর পরেও গুনাহ্ থাকলে কবরের আজাব তার ক্ষতিপূরণের কারণ হয়। তার পরেও গুনাহ্ থাকলে কিয়ামতে ভয়াবহ আজাবের মাধ্যমে তার গুনাহ্ মাফ করা হবে। এর পরেও কারো গুনাহ্ অবশিষ্ট থাকলে

সাময়িকভাবে দোজখের শাস্তি ভোগের পর তাকে বেহেশতে প্রবেশ করান হবে। কিন্তু যে প্রকৃতই কাফের বা অংশীবাদী অথবা আহলে কিতাব (যেমন মূর্তিপূজক, ইহুদী, খৃষ্টান, কাফের ইত্যাদি) সে অনন্তকাল ধরে দোজখের শাস্তি ভোগ করবে।

১৬. ইমানদারগণ আখেরাতে আল্লাহ্তায়ালার দীদার লাভ করবেন। কিন্তু তা হবে দিক, প্রকার এবং উদাহরণ রহিত অবস্থায়। আমাদের ধারণায় দীদারের যে রকম অর্থ আসে, সেরকম নয়। কারণ, আল্লাহ্পাক যেমন ধারণাতীত, তেমনি তাঁর দীদারও হবে ধারণাতীত অবস্থায়।

১৭. নবী ও রসুল প্রেরণ আল্লাহ্পাকের রহমত। তাঁদের দ্বারাই মানুষ সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হয়েছে। তাঁদের প্রতি 'অহি' (প্রত্যাদেশ) সত্য। অহির প্রতিকূল যা কিছু সবই মিথ্যা।

১৮. নবী ও রসুলগণ নিষ্পাপ। তাঁরা আল্লাহ্পাকের নির্বাচিত ব্যক্তি। আল্লাহ্পাকই তাঁদেরকে সর্ব অবস্থায়

হেফাজত করেন বলে তাঁরা গুনাহ্ থেকে সুরক্ষিত থাকতে সক্ষম হন। ঘটনাক্রমে তাঁদের দ্বারা কোনো ভুল হলে আল্লাহ্পাকই তা সংশোধন করে দেন। ভুলের মধ্যে তাঁরা স্থায়ীভাবে আবদ্ধ থাকেন না।

১৯. হজরত মোহাম্মদ সঃ শেষ নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী নেই।

২০. কবর আজাব সত্য। কবরে মুনকির নকির নামক ফেরেশতাদ্বয়ের প্রশ্ন করা সত্য।

২১. কিয়ামত সত্য। হজরত ইস্রাফিল আ. এর শিঙ্গার এক ফুৎকারে যাবতীয় সৃষ্টবস্তু ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এক ফুৎকারে সবাই পুনর্জীবন লাভ করে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে।

২২. হাশরের ময়দানে আল্লাহ্পাক তাঁর বান্দাগণের হিসাব গ্রহণ করবেন। মীযানে (তুলাদণ্ডে) নেকি বদি ওজন করা হবে। সবাইকে পুলসিরাত অতিক্রম করার হুকুম দেওয়া হবে।

২৩. ফেরেশতাগণ আল্লাহ্তায়ালার বান্দা। তাঁরা নিষ্পাপ এবং ভুল-ভ্রান্তি থেকে পবিত্র। তাঁদের পানাহার নেই। তাঁরা স্ত্রীও নন, পুরুষও নন। বেলায়েতের (নৈকট্যের) দিক থেকে তাঁরাই অগ্রগামী। নবুয়তের দিক থেকে নয়। আর নবুয়ত বেলায়েতের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। বেলায়েতে ছোগরা (অলিগণের বেলায়েত), বেলায়েতে কোবরা (নবীগণের বেলায়েত), বেলায়েতে উলিয়া (ফেরেশতাগণের বেলায়েত)— যে কোনো বেলায়েতই হোক না কেন, নবুয়তের মোকাবেলায় তা মহাসমুদ্রের তুলনায় একবিন্দু পানির মতো। বরং তার চেয়েও কম। যেহেতু নবুয়তের সম্মান মানুষকে দেয়া হয়েছে, তাই বিশিষ্ট মানুষই বিশিষ্ট ফেরেশতার তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

২৪. ইমানের অর্থ দ্বীনের বিষয়ে যা কিছু আমাদের নিকট সঠিকভাবে পৌঁছেছে, তার প্রতি কলব বা অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করা, বাক্য দ্বারা সাক্ষী দেওয়া এবং কার্য দ্বারা তা প্রমাণ করা।

২৫. আকৃতিগতভাবে ইমান বাড়ে না, কমেও না। কিন্তু এর উজ্জ্বলতা বাড়ে কমে। যেমন সাধারণ মুমিনের ইমানের ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষা নবী অলিগণের ইমানের ঔজ্জ্বল্য অনেক বেশী। ইমানদারগণের দৃঢ়ভাবে বলা উচিত, 'আমি সত্য ইমানদার'। ইমামে আজম র. এরূপ বলতেন।

২৬. নবীগণের মোজেজা এবং অলিগণের কারামত সত্য। মোজেজা নবুয়তের দাবির শামিল। কারামত দাবির বিষয় নয়। বরং কারামত মোজেজার অনুসরণে সম্পাদিত হয়।

২৭. খোলাফায়ে রাশেদীনের শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম তাঁদের খেলাফতের ক্রমানুযায়ী। যেমন, হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. হজরত ওমর ফারুক রা. অপেক্ষা, তিনি হজরত ওসমান রা. অপেক্ষা এবং তিনি হজরত আলী রা. অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

২৮. সম্মানিত সাহাবীগণের মধ্যে যে সকল কলহ-যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তার উৎকৃষ্ট অর্থ গ্রহণ করতে হবে।

ঐ সমস্ত কলহ প্রবৃত্তিপ্রসূত ছিল না। বুঝবার ভুলের কারণে ঐ সকল ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। মাসআলা উদ্ধার করতে গিয়ে ভুল মাসআলা উদ্ধারকারী একগুণ সওয়াব এবং সঠিক মাসআলা উদ্ধারকারী দ্বিগুণ সওয়াব পান। রসুলে পাক সঃ এর সহবতের ফলে তাঁরা কুপ্রবৃত্তির প্রভাব থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তিলাভ করেছিলেন। সর্বশ্রেষ্ঠ অলিআল্লাহ্ও কখনো সর্বনিম্ন মর্যাদাধারী সাহাবীর মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হন না। কলুষ অন্তরবিশিষ্ট লোকেরাই কেবল সম্মানিত সাহাবীগণের সমালোচনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

আকিদা বিশুদ্ধ করবার পর শরীয়তের পাবন্দ হবার চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, শরীয়ত প্রতিপালনের উপরেই দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। শরীয়তের তিনটি উপাদান— এলেম, আমল ও এখলাছ। এই তিনটি উপাদান পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। এদের যে কোনো একটি বর্জন করলে অপর দু'টি মূল্যহীন হয়ে যায়।

সুতরাং তিনটি উপাদানই সমান গুরুত্ব সহকারে অর্জন করবার ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে।

এবার এক এক করে আমরা এই উপাদানসমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব।

এলেমঃ জ্ঞানই আলো। অজ্ঞতা অন্ধকার। ইসলামের উদ্দেশ্যই হচ্ছে— মানুষকে মিথ্যার অন্ধকার থেকে সত্যের আলোকের দিকে পথপ্রদর্শন করা। তাই ইসলামে এলেম শিক্ষাকে ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। এই এলেম দ্বীনের এলেম— শরীয়তের এলেম। মহানবী সঃ এরশাদ করেছেন, 'প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্যে এলেম শিক্ষা করা ফরজ' (ইবনে মাজা)।

প্রত্যেক মুসলমানকে তাই আল্লাহ্পাকের হুকুমসমূহ সম্পর্কে এবং নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে। হালাল, হারাম, ফরজ, ওয়াজেব এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে এলেম শিক্ষা করা জরুরী। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, এলেম দুই প্রকার। জবানী এলেম এবং কলবী এলেম (মেশকাত)।

মহানবী সঃ এলেম শিক্ষা করাকে ফরজ বলেছেন। শুধুমাত্র জবানী এলেম শিক্ষা করাকে অথবা শুধুমাত্র কলবী এলম শিক্ষা করাকে তিনি ফরজ বলেননি। আর এলেম যেহেতু দুই রকম তাই দুই রকম এলেম শিক্ষা করাই ফরজ। তবে এই ফরজের সীমারেখা কতদূর সে সম্পর্কেও আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে।

আমরা জানি পাঁচটি স্তম্ভের উপরে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও জাকাত। এই পাঁচ স্তম্ভ নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করতে হলে অবশ্যই এই সকল বিষয় কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে, তার এলেম অর্জন করাও আমাদের প্রতি জরুরী হয়ে পড়ে।

কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁরা সম্পদশালী নন, তাঁদের জন্য হজ্ব, জাকাত ফরজ নয়। সুতরাং এসব বিষয়ে এলেম শিক্ষা করাও তাঁদের প্রতি ফরজ নয়। মোট কথা, শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের যার উপরে যতখানি আমল জরুরী হয়ে পড়ে, সে সকল আমল সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় এলেম শিক্ষা করাও ফরজ হয়ে যায়।

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য হাফেজে কোরআন হওয়া, মুহাদ্দিস, মুফাসসির হওয়া ফরজ নয়। তেমনি কলবী এলেমের ক্ষেত্রেও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কুতুব, গাউস, আবদাল, আওতাদ, মোজাদ্দেদ হওয়া ফরজ নয়।

যতটুকু এলেম শিখলে একজন মুসলমানের কলব (অন্তর) গায়রুল্লাহর মহব্বত থেকে মুক্ত হয় এবং কলব সালিম (প্রশান্ত) অবস্থা ধারণ করে, ততটুকু কলবী এলেম শিক্ষা করা ফরজ। কারণ আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'কিয়ামতের দিনে তোমাদের ধন-সম্পদ সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না, কাজে আসবে শুধু সালিম কলব' (সুরা শুআরা)। আর কলবের প্রশান্ত অবস্থা তখনই হাসিল হয়, যখন কলবে জিকিরের নূর প্রজ্জ্বলিত হয়। শান্তি আল্লাহ্র জিকিরের মধ্যেই নিহিত। অন্য কিছুতেই নয়। যেমন, আল্লাহ্পাক এরশাদ করেন, আল্লাহ্র জিকির দ্বারাই কলব শান্তি লাভ করে (সুরা রাআদ)।

জবানী এলেম শিক্ষা করতে গেলে মাদ্রাসায় দাখেল হতে হয়। অথবা ফেকাহ্‌র কেতাব পাঠ করতে হয়। অক্ষরজ্ঞান না থাকলে আলেমগণের কাছ থেকে জেনে শুনে নিতে হয়।

আর কলবী এলেম শিখতে গেলে এমন ব্যক্তির শরণাপন্ন হতে হয়, যার কলবে জিকিরের নূর প্রজ্জ্বলিত থাকে সারাক্ষণ। এইরূপ ব্যক্তির সহবত এখতেয়ারের জন্য তাঁর নিকট মুরিদ বা বায়াত হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বায়াতের প্রেমময় বন্ধনের সূত্র ধরেই এইরূপ বুজর্গ ব্যক্তির কলব থেকে জিকিরের নূর মুরিদের কলবে প্রতিবিম্বিত হয়ে মুরিদের কলবও জিকিরময় হয়ে ওঠে। আর তখনই কলব সালিম অবস্থায় পৌঁছতে পারে। যিনি কলবী এলেম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ তাঁকেই পীর বা মোর্শেদ বলা হয়। জাহেরী এলেম শিক্ষার শেষে অথবা সাথে সাথে কলবী এলেমের শিক্ষায় মনোযোগী হওয়া উচিত। নতুবা ফরজ তরক করার দায়ে দায়ী হতে হবে।

আমলঃ এলেম শিক্ষার সাথে সাথে আমলও করা চাই। কারণ এলেম অর্জনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমল করা। সুতরাং আমল না হলে এলেম শিক্ষার কোনোই অর্থ হয় না।

আমরা আল্লাহ্তায়ালার বান্দা। বন্দেগীর হক আদায় করাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব। আর বন্দেগীর নিয়ম কানুন শিক্ষার জন্যেই আমাদেরকে এলেম অর্জন করতে হয়। তাই এলেম অনুযায়ী আমল করতেই হবে।

এখলাছঃ এখলাছ অর্থ বিশুদ্ধ নিয়ত অর্জন করা। নিয়ত অর্থ সংকল্প— ইচ্ছা। সংকল্পও শুদ্ধ হওয়া চাই। কারণ, একমাত্র আল্লাহ্পাকের হুকুম প্রতিপালন ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য যে কোনো উদ্দেশ্যে যতপ্রকার এবং যতবেশী এলেম শিক্ষা করা হোক অথবা যতবেশী আমল করা হোক না কেনো— তাতে কোনোই লাভ হবে না। তাই এখলাছও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন কীভাবে বিশুদ্ধ নিয়ত অর্জন করতে হয়, সে সম্পর্কে আমরা কিঞ্চিত আলোচনা করব। নিয়তের উৎপত্তিস্থল কলব বা অন্তর। মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা

ফরজ নয়। অন্তরে সংকল্প স্থির করা ফরজ। যে কোনো এবাদত সম্পাদন করার পূর্বে নিয়ত করা জরুরী। হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে— নিয়ত অনুযায়ী আমল বিচার করা হবে (বোখারী)।

কলব বা অন্তকরণ সৎ-অসৎ সকল প্রকার কার্যকলাপের পরিকল্পনাস্থল। শয়তান এই স্থানেই বাসা বাঁধে। মানুষের শত্রু এই শয়তানই মানুষকে অসৎ কর্মের প্রতি প্ররোচিত করে। শয়তান যতক্ষণ কলবকে তার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত কলব থেকে বিশুদ্ধ নিয়ত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, কলবে তার অবস্থানের কারণে কলবও অশুদ্ধ হয়ে যায়। তাই অশুদ্ধ কলবের নিয়ত অশুদ্ধ হতে বাধ্য।

অতএব, কলব বিশুদ্ধ করতে হলে অবশ্যই শয়তানকে সেখান থেকে বিতাড়িত করতে হবে। তবেই সম্ভব হবে এখলাছ বা বিশুদ্ধ নিয়ত করা। হাদিস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, শয়তান মানুষের কলবের মধ্যে হাঁটু গেঁড়ে বসে থাকে। যদি কলব জিকির করে তবে শয়তান সেখান থেকে পালিয়ে যায়, আর যদি কলব জিকির

থেকে গাফেল থাকে তবে শয়তান আবার সেখানে বসে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। (বোখারী)

শয়তান তার মূল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আমাদের নামাজের সময়। কারণ সে জানে, যদি আমাদের নামাজ বিশুদ্ধ হয়, তবে নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রদত্ত যে শক্তি আমরা লাভ করব— সেই শক্তির মোকাবেলা করার ক্ষমতা তার নেই। সকল এবাদতের সারাংশ 'নামাজ' বিশুদ্ধ হলেই কেবল আমরা আল্লাহ্পাকের যাবতীয় অপছন্দনীয় কার্যকলাপ থেকে মুক্ত হতে পারব।

আল্লাহ্পাকের এরশাদ— 'নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে যাবতীয় অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে'। (সুরা আনকাবুত) নামাজ তখনই বিশুদ্ধ হয় যখন নামাজী তার শরীর, পোশাক, মন পবিত্র করে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিয়তে নামাজের রোকনসমূহ যথাযথভাবে আদায় করতে পারে।

আল্লাহ্পাক পবিত্র। পবিত্র ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেউই তাঁর এবাদতে সফল হতে পারে না। শুধু বাহির নয়

অন্তরও পবিত্র করতে হবে। অজু বা গোসল দ্বারা বাহ্যিক পবিত্রতা হাসেল হয়। আর অন্তরের পবিত্রতা হাসেল হয় আল্লাহ্পাকের জিকির দ্বারা।

কলবে আল্লাহ্পাকের জিকির জারী থাকা প্রয়োজন এবং এইরূপ জিকির সকল সময়ই জারী থাকা প্রয়োজন। যখনই কলব জিকির থেকে গাফেল থাকবে তখনই কলবের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণভার চলে যাবে শয়তানের হাতে। সে তখন সর্বপ্রকার নেক আমলের উৎস নিয়তকে করবে কলুষিত এবং সকল অসৎ কার্যাবলী থেকে মুক্তির চাবিকাঠি নামাজের একাগ্রতা নষ্ট করে দিয়ে নামাজকে করবে বরবাদ। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'একাগ্রচিত্ততা ছাড়া নামাজ হয় না'। আল্লাহ্পাক এরশাদ করেছেন, 'সালাত কায়েম কর আমার স্মরণের জন্য' (সুরা ত্বাহা)।

এই বিপদ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার পেতেই হবে। তাই কলবে বিরতিহীনভাবে জিকির জারী করবার জন্য আমাদেরকে কলবী এলেমের ওস্তাদ বা পীরের শরণাপন্ন হতে হবে। প্রকৃত পীর এই এলেমেরই বিশেষজ্ঞ।

এবার বুঝা গেল সুফীগণের মধ্যে প্রচলিত যে কোনো তরিকায় দাখেল হওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এখলাছ অর্জন করা। অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়। যেমন অনেকেই নানান রকম বিকৃত ইচ্ছা নিয়ে বিভিন্ন পীরের দরবারে ভিড় জমান এবং কোনো কোনো পীর নামধারী ব্যক্তিও মানুষের মূল উদ্দেশ্যবিবর্জিত ঐ সকল কলুষ ধারণাকে লালন করে থাকেন।

আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনায় জানলাম যে, এলেম, আমল, এখলাছ— তিনটিই জরুরী। এদের যে কোনো একটি বর্জন করলে অপর দু'টিও মূল্যহীন হয়ে যায়। যেমন কোনো ব্যক্তির যদি এলেম না থাকে, শুধু আমল, এখলাছ থাকে তবে তার কোনোই মূল্য হতে পারে না। আবার যদি এলেম ও এখলাছ থাকে— আমল না থাকে— তখনও একই অবস্থা। আবার এলেম, আমল থাকলেও তা এখলাছের অভাবে হবে নিরর্থক।

সুতরাং বুঝা গেল, শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ হতে গেলে সূফী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত যে কোনো তরিকায় দাখেল হওয়া উচিত। কারণ, তরিকায় দাখেল না হলে

প্রকৃত এখলাছ হওয়া সম্ভব নয়। এই বিবেচনায় তরিকত জাহেরী শরীয়তের খাদেম বা সহায়ক।

এখন প্রশ্নঃ কোন্ তরিকা গ্রহণ করতে হবে? প্রকৃতপক্ষে সব তরিকার উদ্দেশ্য একই। তবে এই জামানার জন্য সবচেয়ে উপযোগী তরিকা হচ্ছে 'খাস মোজাদ্দেদিয়া তরিকা'। কারণ অন্যান্য তরিকার মত কঠোর মোজাহেদা এই তরিকায় উন্নতির শর্ত নয়। আল্লাহ্পাক যেমন আজিমত (কষ্টসাধ্য) আমল পছন্দ করেন, তেমনি রুখসত (সহজসাধ্য) আমলও পছন্দ করেন। জীবন এখন জটিল। সময় সংকীর্ণ। তাই সহজ তরিকাই সকলের গ্রহণ করা দরকার। এই তরিকায় মুরিদ অতি সহজেই তার পীরের রূহানী তাওয়াজ্জোহ্ এর বদৌলতে নিজের কলব জিন্দা করে নিতে পারেন। এর নিম্ন সময়সীমা মুরিদ হবার সঙ্গে সঙ্গে। উর্ধ্ব সময়সীমা চল্লিশ দিন। এর পরের স্তরসমূহও অতিক্রম করা যায় অতি দ্রুত এবং অত্যন্ত সহজে।

একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, তরিকা পৌঁছায় না। পৌঁছায় পীর। অর্থাৎ যত শানদার তরিকাই হোক, সেই তরিকার পূর্ণ কামালিয়াতসম্পন্ন পীরই কেবল

মুরিদগণকে মকছুদ মঞ্জিলে পৌঁছানোর ব্যাপারে রূহানী সহযোগিতা প্রদান করতে সক্ষম। পীরের কামালিয়াত না থাকলে শুধুমাত্র তরিকার নামে বায়াত হলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

আমরা মুসলমান। আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে রসুল সঃ এর পবিত্র বাণী, কুল্লু মুসলিমুন ইখ্ওয়াতুন। সকল মুসলমান ভাই ভাই। আমাদের মনে রাখতে হবে আল্লাহ্র কালাম, উম্মাতুন ওয়াহিদাতুন— তোমরা তো একই জাতি। আজ মুসলমানদের দুর্দিন। সকল পৃথিবী জুড়ে আমরাই আজ সবার চাইতে বেশি অবহেলিত, লাঞ্ছিত। আমাদের নবী মোহম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ সঃ যেমন নবীগণের ইমাম তেমনি আমাদেরও হবার কথা পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের ইমাম বা নেতা। কিন্তু বাস্তব আমাদেরকে কী দৃশ্য দেখাচ্ছে? কী মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ, কী মুসলমান সংখ্যালঘু দেশ— সবস্থানেই আমরা লাঞ্ছিত, অপদস্থ। কোথাও সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে আমরা প্রবৃত্তির পীড়নের শিকার। আবার কোথাও দারিদ্র, অশিক্ষা ও সংখ্যালঘুতার কারণে ইসলামের দুশমনদের দ্বারা নিগৃহীত।

এ অবস্থা থেকে আমাদের আশু উত্তরণ প্রয়োজন। হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া প্রয়োজন। আর প্রয়োজন আত্মসমালোচনায় নিমগ্ন হয়ে নিজেদের দোষত্রুটি থেকে মুক্তির সাধনা। আমরা যারা যে স্তরেরই লোক হইনা কেন— কৃষক শ্রমিক থেকে রাষ্ট্রের কর্ণধার, সবারই মূল পরিচয়, আমরা আল্লাহ্পাকের বান্দা— রসুলেপাক সঃ এর উম্মত। আমাদের রাষ্ট্রপ্রধানের উপরে দায়িত্ব দেশে ইসলামী আইন কানুন প্রবর্তন করা। যাতে করে মানুষের সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আল্লাহ্পাকের আইনই আইন। হে রাষ্ট্রপ্রধানগণ! কোন্ সাহসে আপনারা আল্লাহ্র জমিনে আল্লাহ্র দ্বীন-বিরোধী আইন জিইয়ে রেখেছেন? মনে রাখবেন, আখেরাতে আল্লাহ্র সম্মুখে আপনাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

আলেমগণের উপরে দায়িত্ব— দ্বীনের শিক্ষায় সকল শ্রেণীর মুসলমানকে উজ্জীবিত করা। কোরআন হাদিসের ভিত্তিতে সমকালীন যুগজিজ্ঞাসার ফয়সালা করা, শরীয়তের শান শওকত বুলন্দ করা। আপনারা নিজেদেরকে নায়েবে রসুল বলে মনে করেন। কিন্তু

কোথায় সেই কোরবানী, ত্যাগ? হে আলেম সম্প্রদায়! ভেবে দেখুন, আপনারা কি নায়েবে রসুলের দায়িত্ব পালনে তৎপর রয়েছেন? সম্মান, কর্তৃত্ব, অর্থ, খ্যাতি লাভের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থেকে আপনারা কি বিস্মৃত হননি মহানবী সঃ এর বাণী, 'আখেরাতে ঐ আলেমের সবচেয়ে বেশী শাস্তি হবে— যে তার এলেম দ্বারা উপকৃত হয়নি'।

সুফী সম্প্রদায়ের প্রতি দায়িত্ব— মানুষের অন্তর্জগতে আল্লাহ্প্রেমের নূরপ্রবাহ জারী করবার মহান কাজে আঞ্জাম দেয়া। কিন্তু কী হচ্ছে বাস্তবে? হে সুফী সম্প্রদায়! অর্থ উপার্জন, নজরানা, তাবিজ, ঝাড়-ফুঁক, গান-বাজনা, প্রতিপত্তিশালী মানুষের মোসাহেবী— এসবই হয়ে উঠেছে আপনাদের মূল উদ্দেশ্য। দ্বীনের খাদেম বলে নিজেদেরকে পরিচয় দিয়ে দ্বীনের দুশমনির কাজে আপনারা লিপ্ত হয়েছেন কেন?

দ্বীনের দুশমন তিনটি দল। দুনিয়াদার বাদশাহ্, দুনিয়াদার আলেম (ওলামায়ে ছু) এবং ভণ্ড সুফী। এই তিন দলের এছলাহ (সংশোধন) না হলে দ্বীনের শান বিকশিত হতে পারে না। দ্বীনদার রাষ্ট্রনায়ক, দ্বীনদার

আলেম এবং কামেল সুফীই দ্বীনকে সমুন্নত করবার মহান কাজের আঞ্জাম দিতে পারেন।

সাধারণ মুসলমানগণ দ্বীনকে বিকৃত করবার দায়ে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নন। তবুও তাঁরা সম্পূর্ণভাবে দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। দ্বীনের জ্ঞানার্জন করবার জন্য দ্বীনদার আলেম এবং কামেল পীরের শরণাপন্ন হওয়া তাঁদের জন্যও জরুরী। কিন্তু তাঁরা আলেম ও পীরের শরণাপন্ন হন দুনিয়ার স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। আর তাদের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবসা বিস্তার করে বসেছে আলেম ও পীর সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ।

আর এক দিকে বয়ে যাচ্ছে ইসলামবিরোধী মতবাদের সয়লাব। শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ অনৈসলামিক মতবাদের অন্ধকারে ক্রমশঃ নিমজ্জমান। তাঁরাও দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। তাঁরা ইসলামবিরোধী মতবাদের বিরাটকায় গ্রন্থ অধ্যয়নে, অনুশীলনে ও গবেষণায় সারাক্ষণ নিমগ্ন থাকেন, কিন্তু কোরআন হাদিসের শিক্ষার প্রতি এতটুকু দৃষ্টিপাত করবার সময় তাঁদের নেই। তাঁরা কি জানেন না— দ্বীনের জ্ঞানার্জন, শরীয়তের হুকুম শিক্ষিত-অশিক্ষিত,

শ্রমিক, কৃষক, শিল্পপতি, অধ্যাপক, সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবি সকলের উপর ফরজ।

আমাদের রাষ্ট্রনায়কগণ, আমাদের আলেম সমাজ, আমাদের মাশায়েখবৃন্দ, আমাদের সমাজ সচেতন শিক্ষিত সম্প্রদায়— আমরা সবাই মুসলমান জামাতের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের কারো পদস্খলনে আমরা কেউই উদাসীন থাকতে পারি না। আমরা সবাইতো একক জাতি। উম্মাতুন ওয়াহিদাতুন। আমরা জানি আমাদের কোনো অঙ্গ দুর্বলতার শিকার হলে তাতে আমাদেরই ক্ষতি, তাতে আমাদেরই শক্তি খর্ব হয়। তাই আমরা আমাদের সম্মিলিত আত্মসমালোচনার অংশ হিসেবে প্রত্যেকেই নিজেদের দিকে দৃষ্টিপাত করে ভাল করে বিবেচনা করে দেখিঃ

১. আমাদের আকিদা ঠিক কিনা?

২. আমরা দ্বীনের এলেমের দুইটি ধারাকেই (জবানী এলেম ও কলবী এলেম) সমান গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করছি কিনা?

৩. এলেম অনুযায়ী আমল করছি কিনা?

৪. এখলাছ অর্জনের জন্য যুগোপযোগী তরিকায় দাখেল হয়েছি কিনা?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলির বাস্তব জবাব দ্বারা আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবন সজ্জিত করতে হবে প্রথমে। তারপর এর প্রভাব ছড়িয়ে দিতে হবে পারিবারিক জীবনে, সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং আন্তর্জাতিক জীবনে। তবেই আমাদের সমষ্টিগত জীবনে কায়েম হবে পূর্ণ দ্বীন। তবেই তবলীগ, একামাতে দ্বীন, জেহাদের হক আদায় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

যে ব্যক্তি তার নিজের অস্তিত্বের রাজত্বে পূর্ণ দ্বীন কায়েম করতে সক্ষম নয়, সেকি কখনো রাষ্ট্রীয় জীবনে, সামাজিক জীবনে দ্বীন কায়েম করতে সক্ষম হতে পারে? কখনই নয়।

অতএব, হে মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ! আসুন হুঁশিয়ার হই। সমাজে, দেশে ও বিশ্বে পূর্ণ দ্বীন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সামনে রেখে প্রথমেই নিজেদেরকে পূর্ণ দ্বীনের সাজে সজ্জিত করবার সাধনায় নিয়োজিত হই আমরা।

ওয়াস্‌সালামো আউয়ালাঁও ওয়া আখেরান।

পথ পরিচিত